Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মদিনা আক্তার মনি

রোলঃ 228020544

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মদিনা আক্তার মনি

রোলঃ 228020544

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মদিনা আক্তার মনি, আইডিঃ 228020544 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

মদিনা আক্তার মনি

আইডিঃ 228020544

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভুমিকাঃ 5

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম 5

আত্মশুদ্ধি কি: 7

মানুষের নফস বা আত্মা শিশুর মত: 7

আত্মা এক আজব বসতি: 7

সকল অঙ্গ অন্তরের অনুসারী : 8

বিনয়: 8

শোকর: 9

সবর: 10

ইখলাস: 11

আত্মার রোগ: 12

শিরক: 12

বিদআত: 12

প্রবৃত্তির দাসত্ব করা: 12

গীবত: 13

ক্রোধ: 16

অভ্যন্তরীণ দোষত্রুটির ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ না করা: 17

অহংকার: 17

অহংকারের পরিণতি: 18

অহংকার থেকে বেচে থাকার উপায় : 19

কৃপণতা: 20

নিফাক: 20

নিফাক থেকে বাচার উপায়: 22

উপসংহার: 26

ভুমিকাঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু এবং অফুরন্ত নিয়ামত দানকারী। দরুদ ও সালাম আল্লাহর হাবিব ও আমাদের পথ প্রদর্শক হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ওনার পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরামের উপর।

মুমিনের জন্য আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ করা অপরিহার্য। কেননা এর ওপরই নির্ভর করে ব্যক্তির ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্য, কল্যাণ ও মুক্তি। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا

অবশ্যই সে সফল হয়েছে, যে নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তা বিনষ্ট করেছে। —সূরা শামস (৯১) : ৯-১০

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করে সে সফলকাম পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি ব্যর্থ যে নিজের নফসকে পাপের পঙ্খিলে নিমজ্জিত করে দেয়। দুনিয়াবী বা আখেরাতের সফলতা অর্জনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে নফস। মানুষের জীবনের বাহ্যিক অবস্থা যেমন সুন্দর, সাবলীল, আকর্ষিক, পরিচ্ছন্ন পরিপাটি হওয়া বাঞ্ছনীয় তেমনি অভ্যন্তরীণ অবস্থারও পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন- কুরআন হাদিসে এর জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের দেহে 'দিল' নামের যে ছোট্ট মাংস পিণ্ড দিয়েছেন তাতেই রয়েছে আত্মার অবস্থান যা ধরা যায় না, দেখা যায় না শুধু উপলব্ধি করা যায়।মানুষের যাবতীয় আমলের মূল উৎস ও কেন্দ্র হলো তার নফস বা আত্মা।এই আত্মাকে কুফর, শিরক সহ সমস্ত খারাপি থেকে পবিত্র রাখার নাম ই হচ্ছে আত্মার পরিশুদ্ধি। একমাত্র তারাই সফল হতে পারে, যারা আত্মশুদ্ধির জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। আল্লাহ তায়ালা অন্তরের ইসলাহ ও সংশোধনের জন্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং অন্তরের সংশোধন, সুসজ্জিতকণ ও সুবাসিত-সুগন্ধিযুক্ত করার জন্য রাসুলগণকে পাঠিয়েছেন। আমাদের প্রিয় নবী রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নবী হিসেবে প্রেরণের চারটি উদ্দেশ্যর একটি হলো মানুষকে পরিশুদ্ধ করা,পাক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা।

আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারা এর ১২৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অর্থ: “হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”

অপরদিকে হারাম কাজ, পাপ চিন্তা, পাপ ইচ্ছায় জড়িয়ে যাওয়া হলো নফস বা আত্মার বিনষ্ট। মানুষ যখন তার নফসের প্রতি বেখেয়াল হয়ে যায় পক্ষান্তরে নিজের সমস্ত চাওয়া

পাওয়াকে গুরুত্ব দিতে থাকে নিজের আকল ও বিবেক না খাটিয়ে তখন তা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কষ্টের হয়। সুস্থ, স্বাভাবিক ও প্রশান্তির জীবন যাপনের জন্য নফসের পবিত্রতা অতীব জরুরি। আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু- তা স্পষ্ট উপলদ্ধ হয় সুরা শামসে আল্লাহ তা'য়ালার করা এগারোটি বিষয়ের কসম থেকে। সুরা শামসে আল্লাহ তায়ালা সূর্য ও তার প্রভার,চন্দ্রের,দিনের,রাত্রির,আকাশ এবং যিনি তা গড়েছেন তার,পৃথিবী এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তার এবং আত্মা এবং যিনি তা সুষম করে গড়েছেন তার শপথ করে আত্মার পবিত্রতা অর্জনের কথা বলছেন। এর প্রয়োজনীয়তা এতোই বেশি যে- নিজেদের নফসের সংশোধন, আখলাকের পরিশুদ্ধি এবং আত্মা থেকে অহংকার, হিংসা -বিদ্বেষ, ক্রোধ, শত্রুতা প্রভৃতি দূর করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম অনেক অনেক মোজাহাদা করেছেন।

ঈমানের উৎস হলো হৃদয়। পরিশুদ্ধ হৃদয়েই লালিত হয় বিশুদ্ধ ঈমান। যদি উৎসস্থল তথা অন্তর সরল সোজা হয়ে যায়, ঈমানও সঠিক হয়ে যাবে। কলুষিত হৃদয় ঈমানের জন্য উপযুক্ত নয়। এজন্য নবী সা. ইরশাদ করেন,

لا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُه.

'বান্দার অন্তর সঠিক ও সোজা না হওয়া পর্যন্ত তার ঈমান খাঁটি হবে না।' (মুসনাদে আহমাদ: ১২৮৪৯)

আত্মশুদ্ধির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: অন্তর হল দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী।যার কারণে খুব সহজেই অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর ঈমান বিধ্বংসীয়। অন্তরের এই হালতের চিকিৎসাই হচ্ছে আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়া।এই তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্য হলো, গাফলত ও উদাসীনতার পর্দা দূর করে মুমিনের অন্তরে ঈমানী নূর পয়দা করা। সে নূরের আলোতে চলা-ফেরা ও উঠা-বসা সর্বদায় আল্লাহর জাতের ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখা। আর আত্মার জন্য অর্জন করার মতো যত গুণ-বৈশিষ্ট্য আছে তার সবই অর্জন করা। সর্ব প্রকার আত্মার ব্যাধি সমূহ থেকে মুক্ত হয়ে এগুলোকে নির্মূল করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো। যাতে করে এসবের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। বিশেষ সংখ্যার যিকিরের তালিম ও অন্যান্য আমল আসল মাকসুদ নয় এবং শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াজিব, ফরজও নয়; বরং এ সকল বিশেষ পদ্ধতি মূলত আত্মিক রোগ দূর করার চিকিৎসা ও তদবির মাত্র। যা একজন শায়খে কামিল ও হক্কানী পীর সাহেব তাঁর মুরীদদের অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বাতলে দিয়ে থাকেন। এখন যদি কোনো ব্যক্তি এগুলোকেই আসল মনে করে বসে এবং চূড়ান্ত মাকসূদ নিজ চরিত্র সংশোধন ও আত্মশুদ্ধি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তাহলে নিশ্চয় সে ভ্রান্তিতে রয়েছে এবং তাসাওউফ ও তাযকিয়ার প্রকৃত হাকিকত থেকে একদম বেখবর। [ইসলাহী মাজালিস:১/৪৯]

আত্মশুদ্ধি কি:

আত্মশুদ্ধি অর্থ হলো নিজের সংশোধন, নিজেকে খাটি করা, পরিশুদ্ধ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় সর্বপ্রকার খারাপ কথা ও কাজ থেকে নিজ অন্তর মুক্ত ও নির্মল রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলে। এর আরবি পরিভাষা হলো তাযকিয়াতুন নফস। অন্য পরিভাষায় আত্মশুদ্ধি বলতে আত্মাকে তার বক্রচিন্তা, কুবৃত্তি ও মন্দপ্রবণতাসমূহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র করণ এবং মানবিক মূল্যবোধ, সুচিন্তা ও উত্তম আখলাক দ্বারা তার উন্নতি সাধন করাকে বুঝায়। এটি ইসলাম ধর্মের একটি অন্যতম মৌলিক শিক্ষা।নিজের আত্মাকে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখার নামই হলো আত্মশুদ্ধি।

মানুষের নফস বা আত্মা শিশুর মত:

আল্লামা বূ-সীরি রহ. কাসিদায়ে বুরদায় খুব চমৎকার বলেছেন,
নফসো হলো শিশুর মত। যদি তাকে দুধ না ছাড়াও, পান করাতেই থাকো তাহলে যুবক বয়সেও পান করতে থাকবে আর যদি ছাড়িয়ে দাও তাহলে ঠিকই ছেড়ে দিবে। হয়তো বাচ্চা কান্নাকাটি করবে, রাত জেগে থাকবে এতে মায়ের কষ্ট হবে তবে ছেড়ে অবশ্যই দিবে। ঠিক তেমনি মানুষের নফস ও বাচ্চার মত। গুনাহের সাথে তার নেশা লেগে আছে ওয়ান নাই ও নাফরমানিতে সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। সে নাফরমানি ও গুনাহ করেই মজা পায়। আনুগত্য করা সে ছেড়ে দিয়েছে, এতে স্বস্তি বোধ করে। এখন তুমি যদি তাকে গুনাহে জড়িয়ে রাখতে চাও তাহলে কস্মিনকালেও আত্মা বা নফস গুনাহ ছাড়বে না আর যদি চাও আত্মা গুনাহ ছেড়ে দিবে তাহলে অবশ্যই নফসকে অনেক কষ্ট করতে হবে। কষ্ট এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে।

আত্মা এক আজব বসতি:

মানুষ যখন আত্মশুদ্ধির সাধনা করে তখন বুঝতে পারে এতে কত জঞ্জাল রয়েছে। আত্মার সংশোধন সহজ কাজ নয়। একটি বসতি স্থাপন যেমন সহজ নয়, দীর্ঘ সাধনার পর একটি শহর আবাদ হয়, জনমানুষে মুখরিত হয়, তেমন ই নষ্ট হয়ে যাওয়া আত্মার সংশোধন ও সহজ নয়। কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এ গড়তে হয়। (বই :ইসলামী মাজালিশ ১ম খণ্ড)

সকল অঙ্গ অন্তরের অনুসারী :

শরীরের প্রতিটি অঙ্গ ই অন্তরের অনুগত। অন্তরের ইচ্ছা অনিচ্ছা-ই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত হয়। কোনো মানুষ যদি কারো প্রতি বিরক্ত হয় তখন সে তার দিকে ফিরে ও তাকায় না। যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় কেন তাকাচ্ছেন না- উত্তরে বলবে মনে চায় না। তদ্রূপ মানুষ জন বলে থাকেন খেতে মন চায় না, যেতে মন চায় না, পড়তে মন চায় না। তাকানো, খাওয়া, যাওয়া, পড়া এগুলো সব তো অঙ্গ প্রতংগের কাজ কিন্তু বলা হয় কি? মন চায় না। এ তে বুঝা যায় যে, অঙ্গ প্রতংগের কাজ মন বা অন্তর বা আত্মার উপর নির্ভরশীল। **আত্মার আমল:** আত্মার আমল ভালো ও খারাপ দুই ই হয়। ভালোগুলোর মধ্যে রয়েছে বিনয়, আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করা, বিপদে সবর করা, ইখলাসের সাথে সমস্ত ফরজ, ওয়াজিব আমল করা ইত্যাদি।

বিনয়:

নিজেকে নিজের ক্ষমতাহীন ও তুচ্ছ মনে করা, মনে কোনো অহংকার না থাকা, অক্ষম-অসহায় মনে করা হচ্ছে বিনয়। মানুষ যে রকম ভাবে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে বিনয় দেখায় তা আসলে বিনয় নয়। বিনয়ের সাথে দেহের কোনো সম্পর্ক নেই। বিনয় সম্পূর্ণ আত্মার কাজ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বিনয়ী হতে বলেছেন।বিনয় মানবজীবনের অনন্য সৌন্দর্য। বিনয়ী মানুষকে সবাই ভালোবাসে। বিনয়ের মাধ্যমে সহজে ভালোবাসার বন্ধন তৈরি হয়। পবিত্র কোরআনে বিনয়ীদের আল্লাহর বন্ধু বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আছে,

"তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও বিশ্বাসীরা, যারা নামাজ কায়েম করে জাকাত দেয় ও বিনত থাকে।" (সুরা মায়িদা, আয়াত: ৫৫)

রাসুল (সা.) বলেছেন,

"যিনি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হন, আল্লাহ তাঁকে মর্যাদাবান করেন। তখন তিনি নিজের চোখে তুচ্ছ হলেও মানুষের চোখে অনেক বড় বিবেচিত হন।' (বায়হাকি, হাদিস: ৭,৭৯০)

যিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিনয় প্রকাশ করেন; তাঁর কথাবার্তা, ওঠাবসা, হাঁটাচলায় মার্জিত ভাব আসে। আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হতে চাইলেও বিনয় আবশ্যক। বিনয় মুমিনের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য মানুষকে অনন্য মর্যাদা দান করে। রাসূল সা. মানুষের মাঝে জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল তার বিনয়ী স্বভাব। নবী হওয়ার আগে থেকেই তিনি মানুষের সঙ্গে বিনয়ী আচরণ করতেন, কারো সঙ্গে অহংকার প্রদর্শন করতেন না। তবে হ্যাঁ, বিনয়ী বিনয়ের কারণে দলিত হলে ও জুলুমের স্বীকার হলে শক্ত হওয়ার অনুমতি আছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"মহান আল্লাহ আমার কাছে এ মর্মে অহি পাঠিয়েছেন যে তোমরা বিনয়ী হও—যতক্ষণ না একে অপরের ওপর জুলুম করে এবং অহংকার করে।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪৮৯৫)

শোকর:

যখনই কোনো বান্দা আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত লাভ করে তখনই তার শুকরিয়া আদায় করবে।আল্লাহ তায়ালা শোকর আদায় করার হুকুম করেছেন। আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ:

فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ

কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (সূরা বাকারাহ', আয়াত ১৫২)

শোকর আদায় কি? শোকর আদায় মানে হচ্ছে এই যে, মহান রব আমাদের সব কিছু চাইতে বা চাওয়ার আগেই যে দিয়ে দিচ্ছেন তার জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। এই শোকর ও আত্মার কাজ। শোকর এক বিশাল ইবাদত এ প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফে এরশাদ করেন

"যে লোক খানা হে শোকর আদায় করে সে ধৈর্যশীল রোজাদারের সওয়াব পাবে। এই শোকর এমনই একটি ইবাদত যে মানুষকে শয়তানের থেকে হেফাজত করে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম এবং ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র নিয়ামত যার দিকে বান্দার দৃষ্টিও যায় না এর দিকে কল্পনা নিয়ে যাও এবং শোকর আদায় কর।"

আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত নিয়ামতের প্রতি শোকর আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক নিবিড় হয়। এ শোকর বা কৃতজ্ঞতা মুমিনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। পরকালীন সমৃদ্ধির পাশাপাশি দুনিয়ার জীবনেও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আরও অধিক পরিমাণ নিয়ামত লাভের মাধ্যম এ কৃতজ্ঞতা। আর আখেরাতের অসীম পুরস্কারের ঘোষণা তো আছেই। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য তার শোকর আদায় অত্যাবশ্যক। আল্লাহ মানুষকে দু ভাগে ভাগ করেছেন কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ তিনি অকৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন আর কৃতজ্ঞতা ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

" আমি তাকে পথ দেখিয়েছি হয় সে কৃতজ্ঞ হবে না হয় সে কৃতজ্ঞ হবে"।

(সূরা আল ইনসান, আয়াত ০৩)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

"একমাত্র কৃতজ্ঞ বান্দারায় সত্যিকারের ইবাদত করে সুতরাং যারা কৃতজ্ঞ বান্দা নন তারা প্রকৃত অর্থে ইবাদতকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়"।

(সূরা আল বাকারা; আয়াত ১৭২)

শুকরিয়া আদায় বিভিন্নভাবে হতে পারে। এখানে শুকরিয়া আদায়ের কয়েকটি পদ্ধতি তুলে ধরা হলো

এক. আন্তরিক হয়ে শুকরিয়া আদায় করা। অন্তরের শুকরিয়া হলো, এ বিশ্বাস লালন করা যে, আল্লাহ যে নেয়ামত আমাদের দিয়েছেন, তা তিনি দয়া করেই দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে আমাদের কোনো পাওনা নেই। যা পেয়েছি, সবই তাঁর দয়া। আর তিনি যদি দয়া করেন, তবেই তাঁর দেওয়া নেয়ামত আমরা ব্যবহার করতে পারব, অন্যথায় পারব না।

দুই. মুখে আল্লাহর জিকির করে শুকরিয়া আদায় করা। যেমন আলহামদুলিল্লাহ বলা। সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর রাসুলের শেখানো দোয়াগুলো পাঠ করা। নেয়ামতের জন্য বিশেষভাবে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইত্যাদি। যখনই নেয়ামতের কথা মনে পড়ে, তখনই আলহামদুলিল্লাহ বলা। মুখে প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরেও কৃতজ্ঞতাবোধ লালন করতে হবে। মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের অবস্থার মিল না হলে শুকরিয়া আদায় হবে না।

তিন. আমলের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করা। অর্থাৎ আল্লাহ যেহেতু আমাদের অসংখ্য নেয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন, তাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁর আনুগত্য করা। তাঁর নাফরমানি ও পাপাচার থেকে বিরত থাকা। আল্লাহর দেওয়া আবশ্যক বিধানগুলো পালন করা এবং সব ধরনের অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকাই আমলে মাধ্যমে শুকরিয়া।

চার. নেয়ামতের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করা। যে নেয়ামতগুলো মহান আল্লাহ আমাদের দান করেছেন, সেগুলোর সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাঁর শুকরিয়া আদায় করা আমাদের কর্তব্য। এসব নেয়ামতের অপব্যবহার করলে তা আল্লাহর নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা হবে। আমাদের চোখ, নাক, মুখ থেকে শুরু করে দেহের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং ঘরে-বাইরের সব নেয়ামতের যথাযথ ব্যবহার করা জরুরি। (সংগৃহীত)

আল্লাহ তায়ালা আমাদের শোকরগুজার বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করুন আমিন।

সবর:

আরবিতে ধৈর্য শব্দটি ‘সবর’ হিসেবে পরিচিত। সবর হচ্ছে, বিপদাপদে নিজেকে স্থির রাখা ও আল্লাহর তাআলার ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা।পবিত্র কোরআনে পার্থিব জীবনে ধৈর্য ধারণকারীদের সুসংবাদ দিতে বলা হয়েছে।কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত যাই ঘটুক সবই আল্লাহর তরফ থেকে আসে। অপ্রিয় বা অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো কিছু যখন ঘটবে তখন এটা আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে ভেবে ধৈর্য ধারণ করার নাম ই হচ্ছে সবর। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সবর করতে বলেছেন।

তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো। আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ২০০)।

এই সবর করা সম্পূর্ণ আত্মার কাজ।সবর বা ধৈর্যের গুণটি অর্জনের জন্য নিজের প্রচেষ্টা থাকতে হবে। পাশাপাশি মহান আল্লাহর কাছে তা চাইতে হবে। এরমাধ্যমে ইহকালের সাফল্য ও রহমত থেকে শুরু করে পরকালের শান্তি ও সুখের নিশ্চয়তা রয়েছে। পবিত্র কোরআনে

প্রায় ৯০টি স্থানে শব্দটির ব্যবহার এসেছে। শরয়ী দৃষ্টিকোণ হতে সবরের কয়েকটি ব্যবহার নিচে দেওয়া হলো -

এক. বিপদাপদে নিজেকে স্থির রাখা ও আল্লাহ তায়ালার ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

দুই. প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে গোনাহ ও অন্যায় থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী ও দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান পালনে সদা তৎপর থাকা

তিন. জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকা।

চার. জালেম ও অত্যাচারীদের জুলুম নির্যাতন সহ্য করা।

ইখলাস:

সকল কাজে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি তালাশ করাই হচ্ছে ইখলাস। এককথায় নিয়তের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা হচ্ছে ইখলাস। অন্যভাবে বলা যায়, বান্দা তার জীবনে যা কিছু করবে তার একমাত্র উদ্দেশ্যেই থাকবে আল্লাহকে খুশি করা- এরই নাম ইখলাস। এটি অভ্যন্তরীণ আত্মার আমল। ইখলাস ব্যতীত বাহ্যিক আমল ও নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি গুনাহগার হয়ে যায় ইখলাস বিহীন আমলে। ইখলাস হলো সমস্ত আমলের রুহ। যদি ইখলাস হাসিল না হয়, নাউজুবিল্লাহ সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে। যেমন নামাজ পড়েছে লোক দেখানোর জন্য, রোজা রেখেছে মানুষকে খুশি করার জন্য -এগুলা সবই হচ্ছে ইখলাসবিহীন আমল। আর যদি কোন মুমিন বান্দার মধ্যে ইখলাস থাকে তাহলে সে ইখলাছের যত উপকারিতা ও ফলাফল রয়েছে তা অর্জন করতে পারবে; যথা: গোনাহসমূহ মাফ পাবে, আমল কবুল হবে, সওয়াব লাভ করবে ইত্যাদি। বান্দার যাবতীয় কল্যাণ ইখলাসের মধ্যে নিহিত থাকে। ইখলাসের বিভিন্ন আলামত রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি হলো আমলের বিনিময় আল্লাহর কাছে চাওয়া, নেক আমলের প্রতিযোগিতা করা, আমল গোপন রাখা,অভিযোগ করতে পছন্দ না করা ইত্যাদি।

অন্তরে ইখলাস জাগ্রত হওয়ার উপায় :

★সব সময় অন্তরে আল্লাহ- সচেতনতা ও ভয় জাগ্রত রাখা;

★কাজ করার পূর্বে উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করা;

★অন্তরে আল্লাহর একক সার্বভৌমত্বের ধারণা বদ্ধমূল রাখা।

অপরদিকে রিয়া, অহংকার, হিংসা সহ সমস্ত হারাম কাজ গুলো হচ্ছে আত্মার বদ আমল। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত আমলগুলো পালনের সাথে সাথে সমস্ত হারাম ও গুনাহের কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার নাম হচ্ছে আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়া। পবিত্র কুরআনে আছে- জীবনে সফল একমাত্র তারাই হবে যারা নিজেদের আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারে।

আত্মার রোগ:

আত্মা বা অন্তর ততক্ষণ পবিত্র, পরিশুদ্ধ হবে না যতক্ষণ না আত্মার রোগগুলো নির্মূল হয়। কোনো মানুষের দেহে ক্যান্সার নামক রোগের দেখা দিলো কিন্তু যথা সময়ে তার চিকিৎসা করানো হলো না,, এতে যেভাবে মানুষটার সারা দেহে সেই ক্যান্সার ছড়িয়ে গিয়ে জীবন শেষ হয়ে যায় ঠিক তেমনি অন্তরের রোগগুলোর চিকিৎসা সঠিক সময়ে না করালে আত্মা ও নষ্ট হয়ে যায়। আত্মার নষ্ট মানেই দুনিয়ায় আখিরাত সব জায়গায়ই ধ্বংস অনিবার্য। আত্মাকে রোগমুক্ত তখনই রাখতে পারব যখন আমরা বুঝতে ও জানতে পারব কোনগুলো আত্মার রোগ। আত্মার রোগগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে

শিরক:

শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম। আল্লাহর সাথে শিরক করা তা হোক ছোট কিংবা বড় - আত্মার ধ্বংসের কারণ। এটা এমন এক রোগ যাতে আক্রান্ত অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া যাবে না । যুগে যুগে যত নবী রাসুলগণ এসেছেন তাদের মূল কালিমাই ছিল তাওহীদ বা একত্ববাদ। একজন মানুষের ভিতর যে পরিমাণ তাওহীদ ও বিশ্বাস থাকবে তার অন্তর বা আত্মা ঠিক ততটুকুই পবিত্র বা পরিচ্ছন্ন হবে। যেখানে আত্মা সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো সৃষ্টিকর্তাকে চিনবে, ভালোবাসবে এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে সেখানে সৃষ্টিকর্তার সাথে কোনো কিছু শরিক করা ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই না।

বিদআত:

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালাম) এর পথ অনুসরণ না করে শরীয়তের মধ্যে নব্য পন্থা বের করা হলো বিদআত। এটি মানুষের অন্তর বা আত্মার সাথে আল্লাহর দূরত্ব সৃষ্টি করে। আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক যোজন যোজন দূরত্বের তার আখিরাত যে সুখকর হবে না তা বুঝা খুবই সহজ। বিদআতিদের অন্তর রাসুলের বিরোধিতা করার কারণে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়।

প্রবৃত্তির দাসত্ব করা:

ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে বা নিজের খেয়াল খুশি মতো যা ইচ্ছা তা করে বেড়ানোর নামই হলো প্রবৃত্তির দাসত্ব। এটি এমন এক প্রবণতা যা মানুষকে কুরআন সুন্নতের বিপরীতে কাজ করায়, শরীয়ত পরিপন্থি কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এই প্রবৃত্তির অনুসরণে মানুষের আত্মা বিনষ্ট হয়ে যায়।আল্লাহ তা'আলা প্রবৃত্তির কামনা বাসনার প্রভাব এবং তার অনুসরণ করা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সুরা জাসিয়া'র ২৩ নং আয়াতে বলেন -

أَفَرَأَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَـٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

"আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার খেয়াল-খুশিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে, আর আল্লাহ জেনে-বুঝে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তার শ্রবণ ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার দৃষ্টির উপর রেখেছেন পর্দা? আল্লাহ ছাড়া আর কে তাকে সৎপথে পরিচালিত করবে? তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?"

প্রবৃত্তির অনুসরণকারীদের অন্তরে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মোহর মেরে দেন। নিজ আত্মাকে পবিত্র, পরিশুদ্ধ করতে হলে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

হিংসা বিদ্বেষ : হিংসা মানে কারো প্রতি আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত যেমন ধন দৌলত মান সম্মান যোগ্যতা ইত্যাদি পছন্দ না করা এবং প্রতিনিয়ত তা থেকে অপসারণ কামনা করা। হিংসা নফসের এক ঘৃণ্য ব্যাধি। এই হিংসা যার মধ্যে একবার বাসা বাঁধে তখন শুধু হিংসাই কাজ করে না বরং হিংসা পরায়ণ ব্যক্তির ঈমানও বিপন্ন হয়। সুরস নিসার ৫৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"নাকি তারা এই কারণে মানুষের প্রতি ঈর্ষা করে যে, তিনি তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ দান করেন (কেন?)। আমি তো ইবরাহীমের বংশধরদিগকে কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে বিরাট রাজত্ব দিয়েছিলাম।"

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

"কোনো বান্দার অন্তরে ঈমান ও হিংসা কখনো একসাথে থাকতে পারে না।"

অর্থাৎ যে প্রকৃত অর্থে ঈমানদারের লোক সে কখনো হিংসা করতে পারে না পক্ষান্তরে যেই লোক হিংসা পরায়ণ সে কখনো প্রকৃত মুমিন হতে পারে না। (নাসাঈ, আস সুনান হাদিস নং ৩১০৯)

হিংসা এতোই সর্বগ্রাসী ব্যাধি যে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ই এ থেকে সকল মুমিনদের আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন।

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

এবং(আমি আশ্রয় চাই) হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।(আল ফালাক্ব - ৫)।

গীবত:

রিপুর কাছে পরাস্ত আত্মা গীবত করার পর যতটা ঠান্ডা হয় তা মনে হয় না আর কোনো কিছুতে হয়। কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ ত্রুটি অন্যের কাছে বলার নাম গিবত। গিবত কি তা আরো স্পষ্ট বুঝা যায় রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হাদিস থেকে।রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"তোমরা জানো গিবত কী?"

সাহাবীগণ বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।"

তিনি বললেন, “তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা সে অপছন্দ করে।”
কেউ জিজ্ঞেস করল, “আমি যদি বলি যা সে সত্যিই করে?”
তিনি বললেন, “যদি তা সত্য হয়, তবে তা-ই গিবত। আর যদি তা মিথ্যা হয়, তবে তা তো বুহতান (অপবাদ)।”
—(মুসলিম, হাদিস: ২৫৮৯)
ইসলামে গিবত হারাম ও কবীরা গুনাহ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,
"ধ্বংস তাদের জন্য, যারা পেছনে ও সামনে মানুষকে নিন্দা ও গিবত করে।"
— সূরা হুমাযা (১০৪:১।
আলেমদের মতে গীবতের মূল মাধ্যম চারটি। যথা জিহ্বার গিবত, অন্তরের গিবত, লেখনীর মাধ্যমে গিবত, ইশারা ইঙ্গিত এর মাধ্যমে গিবত।
গীবতের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো জিহবা। আলাপচারিতা কথাবার্তা ইত্যাদির মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি এই গিবত হয়ে থাকে।
কারো সম্পর্কে মনে মনে কু ধারণা পোষণ করা হচ্ছে অন্তরের গিবত।আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বিরত থাকো, কারণ কিছু ধারণা গোনাহ। আর একে অন্যের দোষ খোঁজো না এবং তোমরা একে অন্যের গিবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা ঘৃণা করবে। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদেরকে গ্রহণ করেন এবং দয়ালু।"
— সূরা হুজুরাত (৪৯:১২)
এ আয়াতে গীবতকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আবার কখনো কখনো হাত, চোখ ও মাথা দিয়ে ইশারা করে গিবত হয়ে যায়।
গিবত এমন এক পাপ যা ইচ্ছাকৃতভাবে শুনা ও অপরাধ। যখন কোনো ব্যক্তি কাউকে গিবত করতে দেখবে তখন সে তার সাধ্যমতো অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষ হতে প্রতিরোধ করবে। আর যদি প্রতিরোধ করতে না পারে তখন সে তা শ্রবণ থেকে বিরত থাকবে।গিবত নামক আত্মার এই জঘন্য ব্যাধি থেকে মুক্তির উপায়-
• আল্লাহকে ভয় করা
• কথাবার্তাই সংযমী হওয়া
• অন্যের অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রশংসাও না করা কেননা অনেক সময় প্রশংসা করতে করতে শয়তান ও নফসের ধোকায় পড়ে কখন যে দোষ ত্রুটি বলতে থাকে তার খেয়াল থাকে না।
• অতি প্রয়োজন ছাড়া লোক সমাগম জায়গা পরিহার করা
• হুটহাট কাউকে কোন কিছু না বলে ফেলা ইত্যাদি।
• গীবতের কারণে নফসকে শাস্তি দেওয়া। শাস্তির মধ্যে রয়েছে যাদের জন্য সাদকা করা কঠিন, তারা কিছু টাকা সাদকা করবে এবং যাদের জন্য টাকা-পয়সা কোন ব্যাপার না তারা

নফসকে উপবাস করা মানে হলো কখনো কোন গিবত হয়ে গেলে এক বেলা আহার বন্ধ রাখবে।

গীবতের গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার উপায়: গীবতের সম্পর্ক যেহেতু বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত তাই যখন কোন ব্যক্তির গিবত হয়ে যাবে তখন সাধারণ ভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যতক্ষণ না যে ব্যক্তির গিবত করেছে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির থেকে ক্ষমা পাওয়া জরুরি। ক্ষমা পাওয়ার জন্য যে ব্যক্তির গিবত করা হয়েছে তার কাছে কি কি গিবত করা হয়েছে তার বিশ্লেষণ না করে বরং এ বলা যে আমি তোমার সম্পর্কে যা বলেছি ও যা শুনেছি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।এতে করে ওই ব্যক্তির কষ্ট হবে না।

য যার গিবত করা হয়েছে সে যদি মৃত হয় বা তার কাছে যদি ক্ষমা চাওয়ার কোন উপায় না থাকে তখন করণীয় হল দোয়া ও ইস্তেগফার চালিয়ে যাওয়া যতক্ষণ না পর্যন্ত অন্তর দেয় যে যার গিবত করা হয়েছে সে গীবতকারীর উপর সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহর কাছে এই দোয়া করেছে হে আল্লাহ আপনি তাকে আমার সন্তুষ্ট করে দিন আমার এই গুনাহ মাফ করে দিন।

গীবতের গুনাহের জন্য মাফ চাওয়ার পর ও এর কিছু ক্ষতি থেকে থাকে(মানুষের অন্তরে)। তাই এর ক্ষতিপূরণ হলো যার কাছে গিবত করা হয়েছে তার কাছে ওই ব্যক্তির প্রশংসা করা।

ক্রোধ:

ক্রোধ মানব স্বভাবের একটি মন্দ প্রবণতা। এটি সকল রোগের উৎস। এটি মানুষকে পাপ কাজে জড়িয়ে ফেলে। মানুষ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন ধরনের গালিগালাজ, মারপিট, অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে। কখনো কখনো তার সীমা অতিক্রম করে ফেলে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অন্তরের পরিশুদ্ধির জন্য সর্বপ্রথম এই ক্রোধের চিকিৎসা করা প্রয়োজন। নিয়ন্ত্রণে না থাকলে মানুষ যে কত গুনাহ এবং নাফরমানিতে লিপ্ত হবে তার কোন ইয়ত্তা নেই। তবে অনেক সময় ক্রুধেরও প্রয়োজন আছে মানুষের যদি ক্রোধ না আসে তাহলে বেঁচে থাকা দায়ী হয়ে যাবে। যেমন কোনো শত্রু বা হিংস্র প্রাণী আক্রমণ করলে তখন যদি আপনার মাঝে ক্রোধ না আসে তাহলে পড়ে পড়ে আপনার মার খেয়ে মরে যেতে হবে। সঠিক ও উপযোগী বিষয়ক ক্রুদ্ধ হওয়ার ও প্রয়োজন আছে এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে তা ইবাদত বলেও গণ্য হয়। ক্ষেত্র বিশেষে এই ক্রোধ কখনো ভালো উত্তম এমনকি ওয়াজিব বলেও গণ্য হয় আবার তা হারাম বলেও গণ্য হয়। মনে রাগ সৃষ্টি হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মানুষের কোন হাত থাকে না এটা মনের স্বভাবগত সমস্যা রাগ সৃষ্টি হওয়াতে কোন অপরাধ হবে না যদি না রাগ বা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোন গুনাহ বা অন্যায় কাজ করা হয়। এজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত রাগের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করা হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত এর জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে কোন জবাব দিহি করতে হবে না। আর যখন তা সীমা অতিক্রম করে ফেলে তখন অবশ্যই ক্রোধ নিন্দনীয়। রাগ দোজখের আগুনের একটি টুকরো। এজন্য রাগান্বিত ব্যক্তির চেহারা লাল হয়ে যায়। এর কারণে মারামারি ঝগড়া-ঝাটি, গালাগালি, এমনকি খুনোখুনি পর্যন্ত সংঘটিত হয়। এমনকি অনেকে বৃদ্ধবয়সে এসে তুচ্ছ ঘটনায় বিবিকে তিন তালাক দিয়ে পস্তায়। মহানবী (সা.) এরশাদ করেন, 'ঐ ব্যক্তি বাহাদুর নয়, যে যুদ্ধের ময়দানে দুশমনকে নিচে ফেলে দেয়; বরং ঐ ব্যক্তি বাহাদুর, যে রাগের মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম।' (বোখারি, হাদিস : ৬১১৪)।

অনিয়ন্ত্রিত হওয়ার আগেই একে প্রশমিত করা বাঞ্ছনীয়। ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের মূল শক্তি হচ্ছে হিম্মত ও সংকল্প। নিচে ক্রোধ দমনের কয়েকটি উপায় দেওয়া হল:

যার উপর ক্রোধ এসেছে তাকে সরিয়ে নিবে বা তার থেকে সরে যাবে। এতে করে ক্রোধের তীব্রতা হ্রাস পায়;

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "যখন শয়তানের পক্ষ হতে আক্রমণ আসে তখন আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং পড়বে আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম" পড়বে;

রাগ দমনের ভালো একটি উপায় হল দরুদ শরীফ পড়া;

আল্লাহর গজবের কথা চিন্তা করা অর্থাৎ যখন নিজের মধ্যে ক্রোধ আসবে তখন এই চিন্তা করা যে আল্লাহ তা'আলা চাইলে আমার উপর এর থেকে অনেক বেশি ক্রুদ্ধ হতে পারে;

পানি পান করবে;

অজু করবে ;
কোন কাজে বিশেষত পড়াশোনায় ব্যস্ত হয়ে যাবে। এ সময় কখনো কাজ ছাড়া অবস্থায় থাকা যাবে না।
দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়া আর বসা অবস্থায় থাকলে শুয়ে পড়া।

অভ্যন্তরীণ দোষত্রুটির ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ না করা:

নিজেকে নিজের সঠিক মনে করা এবং নিজের অভ্যন্তরীণ দুষত্রুটির ব্যাপারে কোন ভ্রূক্ষেপ না করা মূলত অহংকারের প্রাথমিক ধাপ। একে আত্মতুষ্টি ও বলা যায় যদি এই আত্মতুষ্টির চিকিৎসা না করা হয় তাহলে পরবর্তীতে এটি অহংকারের রূপ নেয় আত্মতুষ্টিতে ভোগা ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতকে আল্লাহর অনুগ্রহ বা দান মনে না করে নিজের হক মনে করে থাকে। যার পরিণতি খুবই খারাপ।

অহংকার:

ইসলামি পরিভাষায় অহংকার হলো- সত্যকে অস্বীকার করা, মানুষকে হেয় করা, নিজেকে অন্যের তুলনায় বড় জানা এবং অন্যকে তুচ্ছ-নিকৃষ্ট মনে করা। এটি আত্মার একটি মারাত্মক ব্যাধি। অহংকারী ব্যক্তি সর্বত্র লাঞ্চনার স্বীকার হয়। অহংকার শয়তানি চরিত্র।অহংকার হচ্ছে সকল পাপের মূল। একে আরবীতে বলা হয় 'উম্মুল আমরায-সকল রোগের জননী'। বরং বলা যায়, এ জগতের প্রথম পাপই হচ্ছে অহংকার। এই অহংকারের কারণে ইবলিস আমাদের আদি পিতা আদম (আ:) কে সিজদা না করে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়েছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার ৩৪ নং আয়াতে বলেন,
'সে (ইবলিস সম্মানিত আদমকে সিজদার মাধ্যমে সম্মান করতে) অস্বীকার করল এবং অহংকার করল, পরিণতিতে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।'
অহংকার করা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই সাজে। হাদিস কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন,
'অহংকার আমার সম্মানের উত্তরীয় আর সম্মান হচ্ছে আমার গৌরবের পোশাক; যে ব্যক্তি এ দুটির কোনো একটি নিয়ে আমার সঙ্গে টানাটানি করে, আমি তাকে আজাবে নিক্ষেপ করি।' (আবু দাউদ ৪০৯০)
অহংকার কেন হয়: অহংকার কেন হয় তা কুরআন মাজীদ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,
'মানুষ অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করে, যখন সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।' (সুরা-৯৬ আলাক, আয়াত: ৬-৭)
সূরা কাহাফের ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

“সেই ব্যক্তির প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জিত হল। অতঃপর সে কথাচ্ছলে তার সঙ্গীকে বলল, আমার অর্থ-সম্পদও তোমার চেয়ে বেশি এবং আমার দলবলও তোমার চেয়ে শক্তিশালী।”
অর্থাৎ ধন সম্পদ নিয়ে গর্ব করলে অহংকার হয়। কোরআন মাজিদের অন্য সূরায় আল্লাহ তাআলা বলেন,
‘অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। পদচারণে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করো এবং কণ্ঠস্বর নীচু করো, নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।’ (সুরা-৩১ লুকমান, আয়াত: ১৮-১৯)

অহংকারী সম্পর্কে কোরআন কারিমে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বলেন, ‘পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণ করো না, নিশ্চয় তুমি ভূপৃষ্ঠকে কখনোই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি পর্বত সমান হতে পারবে না।’ (সুরা-১৭ বনি ইসরাইল, আয়াত: ৩৭)
অর্থাৎ,
★নিজের আশেপাশে চাটুকার ও অযোগ্য লোক থাকলেও লোকেরা অহংকারী হয়ে যায়।
★ নিজে যা পাওয়ার যোগ্য তার চেয়ে বেশি পেয়ে গেলেও মানুষে অহংকারী হয়ে যায়।
★ নিজের প্রশংসা অন্যের মুখে বেশী করে শুনতে থাকলেও মানুষ অহংকারী হয়ে যায়।
★ নিজের আত্মসমালোচনা যত কম হয়, অহংকার ততবেশি পেয়ে যায়।
★ কথা-কাজ-আচরণে বিনয় কমে গেলে অহংকার জায়গা করে নিতে থাকে।

অহংকারের পরিণতি:

অহংকারের শেষ পরিণতি কি হবে তা বুঝা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস থেকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
"যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"
— (সহিহ মুসলিম: ৯১)
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেছেন,
অহংকারীদের পরিণতি সম্পর্কে রাসুলে আকরাম (সা.) বলেন, ‘অহংকারী ব্যক্তিরা কিয়ামতের দিন উঠবে মানুষের রূপে পিঁপড়াসদৃশ ক্ষুদ্রাকৃতিতে। সর্বত্র লাঞ্ছনা তাদের বেষ্টন করে রাখবে। অতঃপর তাদের বুলাস নামক জাহান্নামের এক কারাগারের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যেখানে লেলিহান অগ্নি তাদের ঢেকে ফেলবে। সেখানে তারা জাহান্নামিদের পোড়া দেহের গলিত পুঁজ-রক্তে পূর্ণ ‘তিনাতুল খাবাল’ নামক নদী থেকে গরল পান করবে।’ (তিরমিজি: ১৮৬২, ২৪৯২; মিশকাত: ৩৬৪৩, ৫১১২)

এছাড়াও,
দুনিয়াতে অহংকারের পরিণতি হলো লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। যার অন্তরে যতটুকু অহংকার সৃষ্টি হবে, তার জ্ঞান ততটুকু হ্রাস পাবে। যদি কারও অন্তরে অহংকার স্থিতি লাভ করে, তবে তার জ্ঞানচক্ষু অন্ধ হয়ে যায়, বোধশক্তি লোপ পায়; সে অন্যের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। তার চেহারায়, আচরণে, চলনবলনে ও কাজকর্মে অহংকারের দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। (বুখারি, মুসলিম, মিশকাত: ৪০২৯)।

অহংকার থেকে বেচে থাকার উপায় :

★যে-সব বিষয় মনের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে, সেগুলিকে তুচ্ছ মনে করা। যেমন: বংশের অহংকার, ধনের অহংকার, পদমর্যাদার অহংকার, বিশেষ কোন নে'মতের অহংকার। এগুলি সবই আল্লাহর দান।
★ভুলক্রমে বা উত্তেজনা বশে অহংকার প্রকাশ পেলে সাথে সাথে বান্দার কাছে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া
★অহংকারের বস্তু নিয়ে চিন্তা করা যে এগুলো আদৌ কি আমার নিজের যোগ্যতা বলে অর্জিত?
লোভের স্বীকার হওয়া : লোভ করা মানুষের অন্তরের একটি মন্দ স্বভাব। লোভ এমন এক রোগ যা মানুষকে অনেক অনেক বড় বড় গুনাহের জড়িয়ে ফেলে এর চিকিৎসা না করালে আখিরাত ধ্বংস হয়ে যায়। সকল অপকর্মের মূল কারণ এই লোভ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,
"মেষপাল এর মধ্যে ছেড়ে দেওয়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাগলের জন্য ততটা ক্ষতিকর নয় যতটা মানুষের সম্পদ ও মান-সম্মানের প্রতি লোভ তার দ্বীন দারীর জন্য ক্ষতিকর" (আহমাদ, আল মুসনাদ হাদিস নং ১৫৭৮৪)
অর্থাৎ দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাগলের জন্য যত টুকু ক্ষতিকর মানুষের লোভ লালসা তার থেকেও বেশি ক্ষতিকর দীনের জন্য।
লোভের স্তর তিনটি।
প্রথম স্তর: এই স্তর মানুষকে মানুষকে প্রকাশ্যে নাজায়েজ ও হারাম কাজ করার জন্য উৎসাহিত করে। যেমন চুরি করে বা ডাকাতি করে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। এটা লোভের মারাত্মক পর্যায়।
দ্বিতীয় স্তর: এই স্তর প্রকাশ্যে মানুষকে হারাম উপায়ে সম্পদ অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করে না ঠিকই কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সম্পদ হস্তগত করার প্রতি উৎসাহ দেয়। এটা মৌলভীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। শয়তান তাদেরকে এই বলে ওয়াসওয়াসা দেয় যে এটা তোমার প্রাপ্য তুমি এটা আদায় করে নাও বাস্তবে আসলে তা তাদের প্রাপ্য নয় এটিও হারাম।

তৃতীয় স্তর: মানুষের অর্থ সম্পদ অধিক থেকে অধিকতর হওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা বা প্রত্যাশা থাকে তবে তা কোন হারাম পন্থায় পেতে চায় না, বা হারাম পথ অবলম্বন করে না এটা হল তৃতীয় স্তরের লোভ। তবে এই লোভ হারাম নয়।

কৃপণতা:

কৃপণতা একটি আত্মিক রোগ। আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে কৃপণতার স্বভাব রেখেছেন। এ কারণে মানুষের মধ্যে অর্থের প্রতি কিছু আকর্ষণ থাকে। তবে হে এই কৃপণতা যতক্ষণ পর্যন্ত ফরজ, ওয়াজিব কাজে বাধা না দেয়, কোন হারাম কাজে জড়িয়ে না ফেলে অথবা ভদ্রতা পরিপন্থি হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েজ। তবে যে কৃপণতা যাকাত দিতে দেয় না, স্ত্রী সন্তানদের ভরণ পোষণ দিতে দেয় না পর্যাপ্ত এবং প্রতিবেশীর হক আদায়ে অসচেতন করে ফেলে তা অবশ্যই নিন্দনীয় এবং আত্মার মন্দ স্বভাব। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সুরা আলে ইমরানের ১৮০নং আয়াতে বলেন,

"আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কেয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও জমিনের স্বত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত"

আমাদেরকে আত্মার এই মন্দ স্বভাব থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন

"তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা কৃপণতা তোমার পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে; কৃপণতা তাদের রক্তপাত করিয়েছে এবং হারামকে হালাল মনে করিয়ে দিয়েছে।"

— (সহীহ মুসলিম, হাদিস: ২৫৩৬)

আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো একটি হাদিস থেকে জানতে পারি যে আল্লাহ তা'আলা দানশীলতাকে পছন্দ করেন এবং কৃপণতাকে অপছন্দ করেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই আত্মিক রোগ থেকে হেফাজত করুক।

নিফাক:

ভালকে প্রকাশ করা এবং মন্দকে গোপন রাখার নাম মুনাফিকী। ইবনু জুরাইজ বলেছেন, মুনাফিক সেই যার কথা তার কাজের, গোপনীয়তা প্রকাশ্যতার, ভেতর বাহিরের এবং বাহ্যিকতা অদৃশ্যমানতার বিপরীত।অর্থাৎ যে প্রকাশ্যে ইসলাম চর্চা করে; কিন্তু গোপনে অন্তরে কুফরী বা

ইসলামের প্রতি অবিশ্বাস লালন করে;এ ধরনের প্রতারণাকে বলা হয় নিফাক আর সেই ব্যক্তিকে বলা হয় মুনাফিক।রাসুলুল্লাহ (স.) মুনাফিকদের চিহ্ন বর্ণনা করে বলেছেনঃ

اٰيَتُ الْمُنَـافِقِ ثَلاَثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَاَخْلَفَ
وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَـانَ

অর্থঃ মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যার বলে যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে আর যখন কোন কিছু তার নিকট আমানত রাখা হয় তার খিয়ানত করে। (সহিহ্ বুখারি)।

মুনাফিকদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى
الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّـارِ

অর্থঃ নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামে সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। (সূরা আন নিসা আয়াত ১৪৫)।

নিফাক দুই প্রকার ;বড় নিফাক ও ছোট নিফাক। যে নিফাক মুখে ইসলামকে স্বীকার ও প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফকে গোপন করে তাকে বড় নিফাক বা নিফাকে আকবর বলে। রাসুলুল্লাহ সাঃ এর যুগে এই ধরনের নিফাক ই বিদ্যমান ছিল। কুরআনে এই ধরনের মুনাফিক কে কাফের বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই ধরনের মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের একেবারে নিম্নস্তরে এবং এরা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে।

আরেক প্রকার নিফাক হচ্ছে আমলের নিফাক। অর্থাৎ যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আছে, আকীদা ঠিক অথচ দ্বীনি আমল ছেড়ে দিচ্ছে কিন্তু আমল করছে বলে প্রকাশ করছে এমন নিফাক হলো ছোট নিফাক। এই নিফাকের কারণে ঈমান নষ্ট হয় না। তবে একে অবহেলা করাও ঠিক না, এই ছোট নিফাক অন্তরে ঝেঁকে বসে বড় নিফাকের সৃষ্টি করতে পারে যা ঈমান বিধ্বংসী।

মুনাফিকদের অন্তর রুগ্ণ ব্যাধিগ্রস্ত থাকে। এরা অধিক লোভী হয়ে থাকে, পার্থিব জীবন অনেক বেশি ভালোবাসে, দ্বিমুখী নীতিতে চলে, আল্লাহর বিধানকে হেয় প্রতিপন্ন করে, মুমিনদের বিদ্রুপ করে, অহংকারী ও দাম্ভিক হয়, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে, মুমিনদের ধোঁকা দেয়, জিহাদকে অপছন্দ করে ইত্যাদি হলো এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এদের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো সালাতে দেরি করা এবং শেষ ওয়াক্তে গিয়ে কোনো রকম সালাত শেষ করা। মুনাফিকরা মানুষদের খারাপ ও মন্দ কাজের দিকে আহ্বান করে।

নিফাক থেকে বাচার উপায়:

★প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করা এবং ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরিমার সাথে শরিক হওয়া ;
★উত্তম চরিত্র অবলম্বন করা;
★দ্বীনি ইলম অর্জন করা;
★সাদকা করা;
★দোয়া করা;
★কিয়ামুল লাইল করা;
★মুনাফিকদের আনুগত্য না করা;
★মুনাফিকদের নেতা না বানানো;
★তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং সর্বদা কঠোর থাকা ;
★তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করা;
★তাদের সাথে বির্তক না করা এবং তাদের থেকে আত্ম রক্ষা করা ইত্যাদি।
আল্লাহ পাক নিফাক নামক এই ব্যাধি থেকে আমাদের হেফাজত করুন আমিন।

দান করে গর্ব ও খোটা দেওয়া : আল্লাহ তা আলা হলেন আমাদের রিজিকদাতা এবং সকল কিছু দানকারী আর আমরা হলাম শুধু মাত্র রিজিক পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম। কিন্তু আমরা অনেক সময় তা ভুলে গিয়ে কখনো কাউকে কোন কিছু দিলে খোটা দিতে থাকি। এটা আত্মার একটা রোগ।

অহেতুক দরিদ্রতা প্রদর্শন করা: মানুষের একটি আত্মিক রোগ হল সামর্থ্য বা ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও নিজেকে দরিদ্র বলে বেড়ানো। এই এই রোগের প্রতিকার হল অভাব-অনটন থেকে থাকলেও যথেষ্ট আর্থিক সামর্থ্য আছে বলে মনে করা।

সবক্ষেত্রে সহজতা তালাশ করা: কিছু মানুষ এমন রয়েছে যে বিভিন্ন ধরনের বাহানা দিয়ে সব জায়গায় সহজ ও সাধারণটাকে গ্রহণ করে নেয়। এটি একটি মানব মনের রোগ। এই রোগ থেকে বাঁচতে হলে প্রয়োজন সমস্ত সন্দেহ পূর্ণ বিষয় ত্যাগ করা।

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা: পার্থিব জীবনে মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন করা, সুরা ফাতাহ এর শেষে আল্লাহ যে গুণাবলি বর্ণনা করেছেন তা অর্জন করা। এবং জীবনে ঈমানের শাখা হিসাবে বর্ণিত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা যেন আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। মানুষের জন্য আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বস্তুত

দেহ ও অন্তরের সমন্বয়ে মানুষ গঠিত। দেহ হল মানুষের হাত পা মাথা বুক ইত্যাদি নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি। আর অন্তর হল আত্মা বা কালব। এ দুটোর মধ্যে কালবের ভূমিকাই প্রধান। মানুষের অন্তর যে-রূপ নির্দেশনা প্রদান করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তদ্রূপই কাজ করে থাকে। সুতরাং মানুষের কাজকর্মের শুদ্ধতার জন্য প্রথমেই কালবের সংশোধন প্রয়োজন। আর কালবের সংশোধনই হল আত্মশুদ্ধি। কালব যদি সৎ ও ভালো কাজের নির্দেশ দেয় তবে দেহও ভালো কাজ করে। একজন মুমীনের বৈশিষ্ট্যই হলো আত্মাকে পরিশুদ্ধ রেখে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা নিশ্চিত করা। আপন আত্মাকে যতবেশি পবিত্র, পরিচ্ছন্ন রাখা যাবে তত বেশি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়ক হবে। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে বান্দা সংযত মনোভাব অর্জন করে। গুনাহর পথে ধাবিত হৃদয়ের লাগাম টেনে সে নিজেকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করে।আত্মশুদ্ধি মুক্তির অন্যতম পথ ও পন্থা। কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে কোনো কিছু কাজে আসবে না। সবাই নিজ নিজ মুক্তির চিন্তায় বিভোর থাকবে সেদিন। আপন পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন, হিতাকাঙ্ক্ষী পালিয়ে বেড়াবে একে অপর থেকে। সেই কঠিন মুহূর্তে শুধু মাত্র বিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারীরা নিশ্চিন্তে থাকবে। যারা পরিশুদ্ধ ঈমান লালন করেছে ও সে অনুযায়ী আমল করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

‘যেদিন ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে যে আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আসবে।’ (সুরা শু‘আরা: ৮৯-৯০)

আত্মশুদ্ধির পদ্ধতি:কোন ব্যক্তি যখন আত্মশুদ্ধির অর্জনের জন্য শায়েখ কিংবা পীরের সহবতে যান তখন তার এটাই উদ্দেশ্য থাকে যে আত্মার জন্য উপকারী এমন গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে অর্জন করবে, আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্ত হবে এবং সকল দোষকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে যাতে এই সমস্ত বিষয় তার নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে যায় এক্ষেত্রে বিভিন্ন দুয়া দুরুদ জিকির আজগার এবং ওজিফা সহায়ক ভূমিকা রাখে।আল্লাহ পাক ইমাম গাযালী (রহ:)কে আত্মিক বিষয়ে বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেছেন। এ সম্পর্কে শিক্ষা দীক্ষা দানের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ওনাকে বিশেষ পদ্ধতি শিখিয়েছেন। ইমাম গাযালী (রহ:) এর মতে আত্মশুদ্ধি অর্জনের পদ্ধতি চারটি। যথা:

প্রথম পদ্ধতি

আল্লাহ ওয়ালার অনুসরণ: নবী-রাসূলগণ ব্যতীত আমরা সকলেই আত্মার রোগী। এখন এরূপ থেকে মুক্তি লাভের উপায় কি? উপায় হল এর জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে সময় কাটাতে হবে। আত্মার রোগ সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার সংশোধন করার জন্য উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি হচ্ছে কোনো আল্লাওয়ালার সহবত অথবা অনুসরণ যিনি অন্তরের রোগ সমূহ নির্ণয় করা এবং এর পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন। যারা অন্তরের চিকিৎসক তাদের সান্নিধ্যে বসার দ্বারা অন্তরে আল্লাহ তাআলার রহমতের বরকতে আত্মা পরিচ্ছন্ন হয়, জীবন

লাভ করে। দ্বীন সম্পর্কে উদাসীন লোকেরাও আল্লাহ ওয়ালাদের সান্নিধ্যে কিছু সময় অতিবাহিত করার দ্বারা অন্তরের পরিবর্তন অনুভব করে। শুধু কিতাবের অক্ষরজ্ঞান মানুষের আত্মশুদ্ধির জন্য যথেষ্ট নয়; বরং কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো আল্লাহ ওয়ালা বা শায়েখের সাথে আত্মশুদ্ধির সম্পর্ক স্থাপন না করে, সাধারণত তার আমল-আখলাক পরিশুদ্ধ হয় না। পবিত্র কুরআনের সুরা আত তাওবাহ'র ১১৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।"

এখানে সত্যবাদী বলতে তাদের বুঝিয়েছেন যাদের মাঝে আল্লাহ-ভীতি আছে , যারা জবান, হাত, কথা, কাজ সবকিছুতে সত্যের পরিচয় দেয়। এগুলো হলো একজন আল্লাহ ওয়ালার মধ্যকার গুণাবলীর সারাংশ।

এই ফিতনা হাসাদের সময়ে এসে একজন আল্লাহ ওয়ালা খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টকর। তবে ন্যূনতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও শর্ত যার মধ্যে পাওয়া যাবে ওনাকে আল্লাহ ওয়ালা মেনে নিয়ে ওনার অনুসরণ করলে ইনশাআল্লাহ আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন সম্ভব। শর্তগুলো হলো:

★প্রয়োজনীয় দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা করা;

★সব সময় শরীয়তের আহকাম তথা: ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতে মুয়াক্কাদা আদায়ে কোনোরকম অবহেলা না করা। হারাম ও মাকরুহ থেকে বেচে থাকা। কোনো ভুল হয়ে গেলে সাথে সাথে তওবা করা ;

★দিন ও রাতের অধিকাংশ সময় অধিক হারে আল্লাহ তায়ালার যিকিরে লিপ্ত থাকা;

★নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোনো কামেল পীর বা আল্লাহ ওয়ালা কর্তৃক অন্যকে আত্মশুদ্ধি ও পথ প্রদর্শনের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে;

★ ওনার সহবতে কিছুদিন বসলে আখিরাতেত প্রতি আকর্ষণ বাড়বে এবং দুনিয়া প্রীতি কমবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি

সত্যিকারের আল্লাহ ওয়ালা খুঁজে না পেলে যদি কোন ব্যক্তির মাঝে উপরিউক্ত ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য ও শর্ত না পাওয়া যায় তখন কোন মুখলেস দ্বীনদার বন্ধুকে আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য নিজের উপর নিয়োজিত করে নিতে হবে বা শরণাপন্ন হতে হবে এবং বন্ধুর কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে -তার দৃষ্টিতে আপনার নিজের মধ্যে কি কি ত্রুটি আছে বা কোন কোন কাজগুলো দৃষ্টিকটু লাগে ওনার।তারপর বন্ধুর থেকে জেনে নিয়ে সেগুলো সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।

তৃতীয় পদ্ধতি

আত্মশুদ্ধির তৃতীয় পদ্ধতিটি হলো নিজ শত্রুর মাধ্যমে নিজের সংশোধন করা। এটা এভাবে করাবে যে, শত্রুপক্ষ যখন দোষ তালাশ করে সে দোষগুলো বলবে তখন সেগুলো খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনবে। অতঃপর শত্রুপক্ষের বলা কথা গুলো সত্যিকার অর্থে নিজের মধ্যে আছে কিনা তা দেখে - থেকে থাকলে সংশোধন করার চেষ্টা করবে।

চতুর্থ পদ্ধতি

আত্মার দোষ সম্পর্কে অবগত হয়ে তা সংশোধন করার চতুর্থ পদ্ধতি হলো, নিজের চোখে অন্য লোকের যে বিষয়গুলো দূষণীয় বা আপত্তিকর - সেগুলো নিজের মধ্যে আছে কিনা খুঁজে বের করা। যদি খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে সাথে সাথে সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
এছাড়াও আরো কিছু উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়।যেমন:
অন্তরের পবিত্রতার জন্য দোয়া করা : অন্তরের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির জন্য এবং আল্লাহর বিধান পালনে তার দৃঢ়তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা আবশ্যক। রাসুলুল্লাহ (সা.) দোয়া করতেন,
‘হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার আনুগত্যে দৃঢ় করে দেন।’ (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ৯৪২০)

আল্লাহর স্মরণ অন্তর নরম করে : আল্লাহর জিকিরে মানব হৃদয় প্রশান্ত ও নরম হয়। এতে আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ হয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,
“জেনে রেখো! আল্লাহর জিকিরেই অন্তর প্রশান্ত হয়।” (সুরা রাআদ, আয়াত : ২৮)

সর্বদা কবর ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করা :হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন,
“তোমরা স্বাদসমূহ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করো”। (তিরমিযী হা/২৩০৭)
সর্বদা আখেরাতকে স্মরণ করা

উপসংহার:

আত্মার সংশোধন ও পাক-পবিত্র করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরজ। নফসের পরিশুদ্ধি ছাড়া কারো পক্ষে সত্যিকার অর্থে দ্বীনের বিধি বিধান প্রতিপালন, দীনের প্রতি অটুট ও অবিচল থাকা, আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। অভ্যন্তরীণ আমল তথা আত্মার পরিশুদ্ধির সহজ পন্থা হচ্ছে সঠিক ইলমের অধিকারী, বিশুদ্ধ আকীদা পোষণকারী, বাহ্যিকভাবে সুন্নতের অনুসারী এবং কোন বুযুর্গের কাছে নিজেকে সংশোধনকারী এমন আল্লাহ ওয়ালার কাছে শরণাপন্ন হওয়া এবং তার দিক নির্দেশনা মোতাবেক আমল করা। নফসের পরিশুদ্ধি ছাড়া যেহেতু মানুষের ঈমান ও ইসলাম পরিপূর্ণ হয় না এবং ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্য এই আত্মশুদ্ধির উপরই নির্ভরশীল তাই আত্মার সংশোধন সঠিকভাবে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেকই হওয়া চাই।